কিতালের কিছু উপকারিতা

শাইখুল হাদীস মুফতি আবু ইমরান হাফিযাহুল্লাহ

কিতালের কিছু উপকারিতা

শাইখুল হাদীস মুফতি আবু ইমরান হাফিযাহুল্লাহ

প্রকাশনা

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

কিতালের কিছু উপকারিতা

শাইখুল হাদীস মুফতি আবু ইমরান হাফিযাহুল্লাহ

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد

فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿14﴾ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿15﴾

সূরা তাওবার দুটি আয়াত তিলাওয়াত করা হলো। আয়াত দুটিতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

“তোমরা তাদের বিরুদ্ধে (অর্থাৎ আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে) যুদ্ধ করো, তিনি তাদেরকে তোমাদের হাতে শাস্তি দেবেন এবং লাঞ্ছিত করবেন। তাদের ওপর তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আর মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন এবং তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন এবং আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” (সূরা তাওবা ০৯ : ১৪-১৫)

এখানে আল্লাহ তাআলা কিতালের ছয়টি উপকারিতার কথা উল্লেখ করছেন।

কিতালের প্রথম উপকারিতা

আল্লাহ তাআলা সকল মুমিনকে লক্ষ করে নির্দেশ দিচ্ছেন, قاتلوهم "তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো" অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর সকল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানের সাড়া দেয়নি, ইসলামের দাওয়াত কবুল করেনি, এমন সবার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো।

ইসলামের দাওয়াত কবুল না করা, এমন একটি অপরাধ, যার শাস্তি অবধারিত। যারাই এ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে তাদেরকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

ইসলামের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সবার কাছে ইসলামের সংবাদটা পৌঁছে যাওয়াই যথেষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব কতটুকু সে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া।" (সূরা তাগাবুন ৬৪ : ১২)

এ থেকে বুঝা যায়, ইসলামের দাওয়াত সবার কাছে পৌঁছে গেলেই আল্লাহর তরফ থেকে অর্পিত দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। একবার পৌঁছে যাওয়ার পর আবার পৌঁছানো, বারবার পৌঁছানো, তাদের সব আপত্তি ও প্রশ্নের সমাধান দিয়ে তাদের অন্তর প্রশান্ত করে দেয়া, এসবের কোনোটাই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

"আপনার পালনকর্তা জনপদসমূহকে ধ্বংস করেন না, যে পর্যন্ত না তার কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ করেন, যিনি তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন আর আমি জনপদসমূহকে তখনই ধ্বংস করি, যখন তার বাসিন্দারা জুলুম করে।" (সূরা কাসাস ২৮ : ৫৯)

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, জনপদের কেন্দ্রস্থলে রাসূল প্রেরণ করা হলেই ওই জনপদের সবার কাছে সংবাদ পৌঁছে গেছে বলে গণ্য করা হয়। তখন তারা যদি দাওয়াত কবুল না করে তাহলে এ কারণে তারা সবাই শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে কাফেরদেরকে শুধু এ কথা বলে দাওয়াত দিতেন যে, তোমরা মুসলমান হয়ে যাও। মুসলমান না হলে মুসলমানদের শাসন মেনে নাও এবং জিযিয়া প্রদান করো। এই হলো দাওয়াত। এরপর তারা যদি দাওয়াত কবুল না করে, জিযিয়া দিতেও প্রস্তুত না হয়, তাহলে তাদের ওপর আযাব চলে আসবে।

আল্লাহর শত্রুদেরকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব আল্লাহর বন্ধুদের

তাওরাত আসার আগ পর্যন্ত আযাব আসার ধরন ছিলো এমন যে, আল্লাহ তাআলা সরাসরি আসমানি বা জমিনি কোনো না কোনো

আযাব পাঠিয়ে দিতেন। ওই আযাবে তারা সবাই এক সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যেত।

নূহ (আ)-এর কওমকে পানি দিয়ে, লূত (আ)-এর কওমকে পুরো এলাকা উল্টে দিয়ে, ফিরাউন ও তার দলবলকে সাগরে ডুবিয়ে মারার মাধ্যমে আযাব দিয়েছেন। এভাবে বিভিন্ন কওমকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ধরনের আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করেছেন।

তাওরাত আসার পর থেকে বিশেষ করে কুরআন আসার পর কাফেরদেরকে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয় মুমিনদের ওপর। আল্লাহর বন্ধুদের ওপর, আল্লাহর সৈনিকদের ওপর।

এ উম্মতের বিশেষ মর্যাদার একটি কারণ এটাও যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে কাজটি মালাইকাদের মাধ্যমে করাতেন, এখন সেই কাজটির দায়িত্ব এই উম্মতকে দিয়েছেন। এখন এই শাস্তিটি বাস্তবায়ন করবে এই উম্মত। উম্মতে মুহাম্মদী। এ জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলছেন, قاتلوهم 'তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো' يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দিবেন।

তাহলে এখন কাফেরদের ওপর শাস্তি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে মুসলমানরা তাদের হাত প্রসারিত করবে। আর আল্লাহ তাদের হাত দিয়েই কাফেরদেরকে শাস্তি দিবেন।

এখন যদি আল্লাহর সৈনিকরা নিজেদের হাত প্রসারিত না করে, তাহলে কাফেররা তাদের পাওনা শাস্তিটা পাবে কীভাবে? দেখুন,

কাফেররা হলো আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রাষ্ট্রের বিদ্রোহী সদস্য। এই বিদ্রোহীদের ব্যাপারে রাষ্ট্রের সৈনিকদের প্রতি রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশ হলো, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তাদেরকে পরাজিত করো। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে দমন করো। এখন যদি সৈনিকরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তাহলে তারা কি রাষ্ট্রের সৈনিক হওয়ার উপযুক্ত থাকে? তাদেরকে কি সৈনিক হিসেবে রাখা হবে? না, বের করে দেওয়া হবে? আর সেনাবাহিনীতে কি শুধু বের করে দেওয়া হয়? না, কঠিন শাস্তি দেয়া হয়? কখনও মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়। এটাই হলো সেনাবাহিনীর কমান্ড না মানার শাস্তি। ওখানে মর্যাদা যেমন উঁচু, দায়িত্বও তেমন বেশি, সেই দায়িত্ব পালন না করলে শাস্তিও হয় কঠিন।

একই ভাবে উম্মতে মুসলিমার ওপর দায়িত্ব হলো, আল্লাহদ্রোহী, কাফের, বেঈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া।

এখন তারা যদি সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে এবং কাফের, বেঈমানদেরকে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে দেয় তাহলে নিজেরা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। আর যদি তারা এ দায়িত্ব পালন না করে তাহলে আল্লাহ তাআলা সবাইকেই শাস্তি দিবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন ব্যাপক শাস্তি আসবে, যা মুসলমান কাফের নির্বিশেষে সবাইকে পাকড়াও করবে। কাউকেই ছাড়বে না।

তো আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন, قاتلوهم "তোমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো" يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِأَيْدِيكُمْ "আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়ে তাদেরকে শাস্তি দিবেন।"

শাস্তি আল্লাহই দেবেন, তবে তোমাদের হাতটা ব্যবহার করবেন

অনেক সময় এমন হতে পারে, যাদেরকে শাস্তি কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে শত্রুদের সমপর্যায়ের অস্ত্র-শস্ত্র নেই, যুদ্ধের সরঞ্জামাদি নেই। আর বাস্তবে এমনই হয়ে আসছে। সব যুগেই দেখা গেছে, মুসলমানের বাহ্যিক শক্তি কাফেরদের তুলনায় অনেক কম ছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেও দেখা গেছে, সাহাবায়ে কেরামের যুগেও দেখা গেছে। বাহ্যত মুসলমানদের শক্তি, সংখ্যা, অস্ত্র-শস্ত্র সবই ছিলো কাফেরদের তুলনায় অনেক কম। কখনও একদিকে তিন হাজার, অপর দিকে এক লাখ। কখনও একদিকে ত্রিশ হাজার, অপরদিকে দুই লাখ। ইসলামী ইতিহাসের অধিকাংশ যুদ্ধের চিত্রই ছিলো এমন। দুপক্ষের মাঝে ব্যবধান ছিলো বিশাল। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন তো ঈমানদারদেরকে লক্ষ্য করে আগেই বলে রেখেছেন,

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"তোমরা হীনবল হয়ো না, বিষণ্ন হয়ো না। (প্রকৃত) মুমিন হলে তোমরাই জয়ী হবে।" (সূরা আলে ইমরান ০৩ : ১৩৯)

অর্থাৎ অস্ত্রে-শস্ত্রে, টেকনোলজিতে, উপকরণাদিতে, সৈন্য সংখ্যায় তোমরা যদি দুশমনের সমপর্যায়ের নাও হও, তবুও এতে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ তাদেরকে শাস্তি তো দিবেন আল্লাহ। তিনি শুধু তোমাদের হাতগুলো ব্যবহার করবেন। তোমাদের যতটুকু সাধ্য আছে ততটুকু সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে নাও। বাকি কাজ তো আল্লাহই করবেন। তোমাদের হাতগুলো ব্যবহার করে তিনিই তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিবেন।

এ আয়াতে কিতালের যে ছয়টি উপকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এটি হলো তার মধ্যে প্রথম উপকারিতা। তোমাদের হাত দিয়ে তিনি তাঁর শত্রুদেরকে শাস্তি দেবেন।

দ্বিতীয় উপকারিতা

এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, وَيُخْزِهِمْ তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, অপদস্থ করবেন।

দেখুন, কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত করা, অপদস্থ করা শরীয়তে কাম্য। কোনো কাফের সম্মান পেতে পারে না। বিদ্রোহীরা কখনও মর্যাদা পেতে পারে না। তাদেরকে সবসময় লাঞ্ছিত অবস্থায়ই থাকতে হবে। যুদ্ধ করতে এলে তো লাঞ্ছিত হবেই, যদি যুদ্ধ না করে জিযিয়া দিতে সম্মত হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও তাদেরকে লাঞ্ছিত হয়েই জিযিয়া আদায় করতে হবে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রব্বুল আলামীন পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন,

قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"কিতাবধারীদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিবসের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম গণ্য করে না এবং সত্য দীন গ্রহণ করে না, তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না নতি স্বীকার করে স্বেচ্ছায় জিযিয়া প্রদান করে।"(সূরা তাওবা ০৯ : ২৯)

অর্থাৎ তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা বন্ধ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা লাঞ্ছিত হয়ে জিযিয়া দেয়। লাঞ্ছিত হয়ে জিযিয়া দিতে রাজি হলেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ হতে পারে।

তো এটি হলো কিতালের দ্বিতীয় উপকারিতা। তোমরা কিতাল করলে এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করবেন, অপদস্থ করবেন।

তৃতীয় উপকারিতা

এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ তিনি তাদের ওপর তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ যদি কাউকে সাহায্য করেন তাহলে দুনিয়ার আর কেউ সাহায্য না করলেও বিজয়ী তো সে-ই হবে, তাই না?

একটি সংশয়ের নিরসন

তবে অনেক সময় দেখা যায়, বাহ্যিকভাবে মুসলমানরা পরাজিত হয়। এর কারণ হলো, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে 'দারুল আসবাব' বানিয়েছেন। এখানকার সবকিছুকে তিনি উপকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। তাই যথেষ্ট পরিমাণ উপকরণ না থাকলে ফলাফল না আসাই স্বাভাবিক।

একটি উদাহরণ দেই। কাফেররা মুসলমানদের কোনও এলাকায় আক্রমণ করলে সে আক্রমণ প্রতিহত করা প্রথমে সেই এলাকার মুসলমানদের ওপর ফরযে আইন হয়ে যায়। তারা প্রতিহত না করলে বা করতে না পারলে পর্যায়ক্রমে গোটা পৃথিবীর সকল মুসলমানের ওপর ফরয হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আক্রমণ প্রতিহত না হবে ততক্ষণ সকল মুসলমানের ওপর নিজেদের জান-মাল খরচ করা ফরয হয়ে যায়।

বর্তমানে অবস্থাটা কি এমন না? বর্তমানে আমরা পৃথিবীর সব জায়গায় আক্রান্ত। সব জায়গায় মার খাচ্ছি। এ অবস্থায় পৃথিবীতে যত মুসলমান আছে সবার ওপরই শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা ফরযে আইন হয়ে গেছে।

বর্তমানে পুরো পৃথিবীতে যদি দেড়শ কোটি মুসলমান থাকে তাহলে এই দেড়শ কোটি মুসলমানের ওপরই জিহাদ ফরয হয়ে গেছে। কিন্তু দেড়শ কোটি মুসলমানের মধ্যে ফরয আদায়ের জন্য বের হয়েছে মাত্র কয়েক হাজার। দেড়শ কোটির ভার কি কয়েক হাজার জনে বহন করতে পারবে?

সম্মিলিত অপরাধের প্রতিবিধান এক-দুজনের তাওবা দ্বারা হয় না। এমন তাওবার সুফল সাধারণত দুনিয়াতে প্রকাশ পায় না। তবে যারা তাওবা করে তারা ব্যক্তিগতভাবে আখিরাতে নাজাত পাবে। কিন্তু দুনিয়াতে তাদের তাওবার সুফল দেখা যাবে না।

হাদীসে এসেছে, ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হলে আরবের এক জালিম শাসক তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী পাঠাবে। কিন্তু সেই বাহিনী মক্কা-মদিনার মাঝামাঝি এক জায়গায় পৌঁছলে ওই সময় এলাকায় থাকা সাধারণ লোকজনসহ পুরো বাহিনী মাটিতে ধসে যাবে। জমিন তাদের গ্রাস করে নিবে। একথা শুনে আয়েশা (রাযি) জিজ্ঞাসা করেন, সবাইকে কেন ধসিয়ে দেয়া হবে অথচ সেখানে বাজারের সাধারণ লোকজনও থাকবে এবং এমন লোকও থাকবে যারা ওই সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত নয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেখানকার সবাইকেই ধসিয়ে দেয়া তবে আখিরাতে প্রত্যেককে তার নিয়ত অনুযায়ী উঠানো হবে। (সহীহ বুখারী: ২১১৮; সহীহ মুসলিম: ২৮৮৪)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, সম্মিলিত অপরাধের শাস্তি সম্মিলিত ভাবেই আসে। সেখানে কিছু লোক সেই অপরাধ না করলেও দুনিয়াতে তাদের হিসাব হয় না। হ্যাঁ, আখিরাতে প্রত্যেকের হিসাব আলাদা হবে। যে যেমন তার হিসাবও হবে তেমন। কিন্তু দুনিয়া এমন হবে না।

একইভাবে বর্তমানে জিহাদ সবার উপরই ফরয কিন্তু অল্প কিছু লোক এই ফরয আদায়ের জন্য দাঁড়ালো। তাহলে তারা নিজেরা

ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে বিরাট মর্যাদা পাবে ঠিকই, তবে তা হবে আখিরাতে। দুনিয়াতে দীনের বিজয় এই অল্প সংখ্যক দিয়ে আসবে না। দুনিয়াতে বিজয় আসার জন্য আল্লাহ তাআলা যে পরিমাণ আসবাবের উপস্থিতি নির্ধারণ করে রেখেছেন তা পাওয়া যেতে হবে।

যারা ইচ্ছুক তাদের করণীয়

সবার উপরই ফরয কিন্তু অন্যরা বের হচ্ছে না বলে যারা বের হতে ইচ্ছুক তারাও কি বসে থাকবে? না, না। বরং প্রত্যেকের করণীয় হলো নিজের যতটুকু সাধ্য আছে ততটুকু খরচ করা। জয়-পরাজয় তো আল্লাহর হাতে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللهِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তার সাওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়"। -সূরা নিসা ০৪ : ১০০

অন্য আয়াতে বলেন,

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহর (তরফ থেকে প্রাপ্ত) ক্ষমা ও করুণা তারা যা কিছু সংগ্রহ করছে তার চেয়ে বহুগুণ উত্তম।” সূরা আলে ইমরান ০৩ : ১৫৭

অর্থাৎ বিজয় আসার আগেই যদি নিহত হয়ে যায় তাহলেও আল্লাহর কাছে সে পুরস্কার লাভ করবে। কারণ তার সাধ্যে যা ছিলো তা সে করেছে। তার ওপর যা ফরয ছিল তাতে সে নিয়োজিত হয়েছে। সারকথা হলো, আমাদেরকে আমাদের সাধ্যানুযায়ী যা করার করতে হবে। এতে কোনোরূপ অবহেলা করা যাবে না।

তো এটি হলো কিতালের তৃতীয় উপকারিতা। আল্লাহর বন্ধুরা তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে কিতাল করলে তারা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।

চতুর্থ ও পঞ্চম উপকারিতা

এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ “আল্লাহ মুমিন জাতির অন্তর প্রশান্ত করবেন”।

যারা সত্যিকারের মুমিন তারা কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হতে দেখে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করে। কারণ, কাফেররা আল্লাহর শত্রু আর মুমিনরা হলো আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহর শত্রুদেরকে

পরাজিত ও অপমানিত অবস্থায় দেখলে আল্লাহর বন্ধুদের কাছে ভালো লাগবে এটাই তো স্বাভাবিক।

তাদের এ অবস্থা দেখে অন্তরে প্রশান্তি লাগলেই বুঝা যাবে ভিতরে ঈমান আছে। কারও মনে প্রশান্তি এলেই বুঝা যাবে সে মুমিন। পক্ষান্তরে যদি কারও কাছে খারাপ লাগে, কাফেররা মুসলমানদের হাতে মার খাচ্ছে, পরাজিত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে, নাকে খত দিয়ে নিজেদের পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছে এসব যদি কারও কাছে খারাপ লাগে, কষ্ট লাগে তাহলে সে কিসের মুমিন?

এটি হলো কিতালের চতুর্থ উপকারিতা। কিতালের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তর প্রশান্ত করবেন।

এরপর বলছেন, وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ "আল্লাহ তাদের অন্তরের ক্ষোভ দূর করবেন"।

এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, প্রকৃত মুমিনদের অন্তরে কাফেরদের প্রতি ক্ষোভ থাকবে। কাফেরদেরকে লাঞ্ছিত হতে দেখে তাদের অন্তরের সেই ক্ষোভ দূর হবে।

এটি হলো কিতালের পঞ্চম উপকারিতা। কিতালের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে জমে থাকা ক্ষোভ দূর করবেন।

ষষ্ঠ উপকারিতা

এরপর আল্লাহ তাআলা বলছেন, وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ "এবং আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করবেন"।

যেসব মুসলমান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে তারা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করবে। কেউ শাহাদাত লাভ করবে। কেউ মাগফিরাত ও রহমত লাভ করবে। আর যেসব কাফের যুদ্ধে পরাজিত হবে তারা ইসলাম সম্পর্কে জানার ও বুঝার চেষ্টা করবে। তারা যখন চিন্তা করবে, তাদের তুলনায় মুসলমানদের শক্তি সামর্থ্য এত কম থাকা সত্ত্বেও কেন তারা জয় লাভ করলো? বাহ্যিকভাবে তো তাদের জয়ের কোনো সম্ভাবনা ছিলো না তবুও তারা কেন জয়ী হলো? তাহলে কি তাদের সঙ্গে কোনও ঐশী শক্তি রয়েছে, যা তাদের পক্ষে থাকার কারণে এমন হলো? এসব নিয়ে তারা যখন ভাববে, চিন্তা করবে তখনই তাদের সামনে ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আর তখন তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করবে। আর বাস্তবেও এমন ঘটেছে। মুসলমানরা যে অঞ্চলে যুদ্ধ করে জয়লাভ করেছে, সেখানকার জনসাধারণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এটাই হলো আল্লাহ তাআলার সুন্নাহ বা নীতি। যখন বিজয় আসে তখন মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। যেমন সূরা নাসরের শুরুতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾

"যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন..."।-সূরা নাসর ১১০ : ১-২

মানুষের স্বভাব হলো, সে যে ধর্মের ওপর জন্মগ্রহণ করে, ছোটোকাল থেকে তার আপনজনদেরকে যে ধর্ম পালন করতে দেখে সেও সেই ধর্ম নিয়েই বড়ো হয় এবং জীবনভর সে ওই ধর্মের ওপরই থাকতে চায়। তা থেকে কোনোভাবেই সরতে চায় না। নিজের ধর্মের ভুলগুলো এবং অন্য ধর্মের সৌন্দর্যগুলো সাধারণত তার চোখে ধরা পড়ে না। ফলে তাকে যদি জোর করে এ অবস্থাটা থেকে সরানো না হয় তাহলে সে এ অবস্থার ওপরই মৃত্যুবরণ করে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামি হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি তাকে জোর করে এ অবস্থা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে ইসলামের সত্যতা তার সামনে প্রকাশ পেয়ে যায়, ইসলামের গৌরব, ইসলামের বিজয় তার সামনে ফুটে উঠে, তখন সে ইসলাম নিয়ে ভাবতে শুরু করে। এভাবে সে একসময় ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

তাই শুরুতে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষের সহজাত এই প্রবণতাটা দূর করতে হবে। শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া কেবল কথা দিয়ে বুঝিয়ে সাধারণত কাউকে তার জন্মগত এই প্রবণতা থেকে বের করে আনা যায় না। প্রতিটি মানুষই চায়, সে যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছে, যাদের মাঝে বেড়ে উঠেছে তাদের আদর্শ, সভ্যতা, কৃষ্টি-কালচার নিয়েই বেঁচে থাকতে। তা সত্য, না মিথ্যা, ওসব নিয়ে সাধারণত সে চিন্তাও করে না।

নবী-রাসূলগণও কেবল কথা দিয়ে বুঝিয়ে তাদের এই প্রবণতাটা দূর করতে পারেননি। তাই তো আমরা দেখতে পাই, নূহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীর্ঘ সাড়ে নয়শত বছর বুঝিয়েছেন কিন্তু দীন গ্রহণ

করেছে মাত্র ৮০-৮৫ জন। একজন নবীর বুঝানোর পরও তাঁর কথা বুঝে তা গ্রহণ করে নেয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা কতো কম।

পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে যাদের শরীয়তে যুদ্ধ-জিহাদের বিধান ছিলো না তাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাঁরা আজীবন মৌখিক দাওয়াত দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সেই দাওয়াতের ফলে ব্যাপকভাবে মানুষ আল্লাহর দীন গ্রহণ করেনি। পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিতও হয়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মক্কায় তেরো বছর এই বুঝানোর কাজই করেছেন। কিন্তু এই তেরো বছরে সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে দূরের কথা, মক্কার ছোট্ট শহরেও হয়নি। পরবর্তীতে তিনি যখন যুদ্ধ-জিহাদের পথ গ্রহণ করেন, তখন দেখা গেছে খুব বেশি সময় লাগেনি মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে।

কিতালের বিধান আল্লাহর 'আলীম' ও 'হাকীম' গুণের বহিঃপ্রকাশ

কিতালের এ বিধানটি আল্লাহ তাআলার অনেক বড়ো একটি রহমত। এর মাধ্যমে অসংখ্য অগণিত মানুষের সামনে থেকে ইসলাম গ্রহণ করার সকল বাধা দূর হয়ে যায়।

আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

জিহাদ ও কিতালের এ বিধানটি যে শতভাগ উপকারী ও কল্যাণ আনয়নকারী তা আল্লাহ জানেন। তিনি 'আলীম'-সর্বজ্ঞ। পাশাপাশি

তিনি ‘হাকিম’- সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর গুণবাচক দুটি নাম উল্লেখ করেছেন। ‘আলীম’ ও ‘হাকীম’। এখানে এ দুটি গুণ এনে বুঝানো হয়েছে, জিহাদের এ বিধানটি তাঁর ‘আলীম’ ও ‘হাকীম’ গুণের বহিঃপ্রকাশ। তিনি তাঁর অসীম ইলম, হিকমত ও প্রজ্ঞার আলোকে এ বিধান দিয়েছেন।

দেখুন, ‘হিকমাতুন’ শব্দের অর্থ হলো, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হুকুম পালন করার বিশেষ পদ্ধতি।

আরবীতে فِعلَة ‘ফিলাতুন’ ওযনটি কাজের ধরন ও পদ্ধতি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, جلست جلسة القارىء ‘জালাসতু জিলসাতাল কারী’ যার অর্থ হলো, আমি পাঠকের বসার মতো বসেছি।

جلسة শব্দটির অর্থ, বসার ধরন বা পদ্ধতি। একই ভাবে ‘হিকমাতুন’ শব্দটির অর্থ হবে, হুকুম পালন করার ধরন বা পদ্ধতি। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতকে ‘হিকমত’ বলা হয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নতগুলোই হলো, আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করার ধরন বা পদ্ধতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার হুকুমগুলো কীভাবে পালন করতে হবে সে পদ্ধতিই আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন।

বর্তমানে কিছু লোককে বলতে শোনা যায় যে, আমরা জিহাদের এ হুকুমটি হিকমতের (?) খাতিরে ছেড়ে দিচ্ছি। কী আশ্চর্য! আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দিচ্ছে আর বলছে, হিকমতের খাতিরে ছেড়ে দিচ্ছি!

হিকমত আসলে কিসের নাম? আল্লাহর হুকুম ছেড়ে দেওয়ার নাম? না, হুকুমকে যথাযথ পদ্ধতি মোতাবেক পালন করার নাম?

এখানে জিহাদের বিধান দেয়ার পর তাঁর গুণবাচক নাম 'হাকীম' এনে এ কথাই বুঝানো হচ্ছে যে, এ বিধানটি তিনি তাঁর অসীম হিকমত ও প্রজ্ঞার আলোকেই দিয়েছেন।

অতএব ওই সব লোকের কথা সম্পূর্ণ ভুল ও বিভ্রান্তিকর, যারা বলে, বর্তমানে জিহাদ না করা হলো হিকমত, জিহাদ করাটা হিকমতের পরিপন্থী। এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে, জিহাদ করাই হলো হিকমত।

'হাকীম' শব্দের আগে 'আলীম' শব্দটি এসেছে। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, কিতালের নির্দেশ তাঁর 'আলীম' গুণের বহিঃপ্রকাশ। তিনি তাঁর অসীম ইলমের আলোকে এ নির্দেশ দিয়েছেন।

অতএব যারা কিতালের বিধানকে কল্যাণকর বলে জানবে এবং সেই জানা অনুযায়ী আমলও করবে অর্থাৎ কিতালের পথে চলবে তাদের ইলম আল্লাহর ইলমের মোতাবেক হলো। সুতরাং তাদের ইলমটা হবে আসল ইলম এবং তারাই হবে সত্যিকার আলেম ও প্রকৃত ইলমের অধিকারী। পক্ষান্তরে যারা কিতালকে ক্ষতিকর মনে করবে এবং কিতালের বিরোধিতা করবে তারা কোনোক্রমেই সত্যিকার আলেম হবে না। তারা যা জানে তাকে মালূমাত (অর্জিত জ্ঞান) বলা যেতে পারে কিন্তু তাকে আল্লাহ প্রদত্ত ইলম কোনোভাবেই বলা যায় না। লক্ষ্য করুন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

"তোমাদের ওপর কিতাল ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হয়তো কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে তা অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না।" (সূরা বাকারা ০২ : ২১৬)

এখানে আয়াতের শেষে বলা হচ্ছে, وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। অর্থাৎ কিতাল যে সর্বাবস্থায়ই কল্যাণকর, এটি হলো আল্লাহর ইলম। وَاللهُ يَعْلَمُ

আর কিতাল অকল্যাণকর, এটি হলো বান্দার জাহালাত। وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

বান্দার কাছে সত্যিকার ইলম নেই বলেই সে কিতালকে অকল্যাণকর ভাবছে।

অতএব যারা কিতালকে কল্যাণকর জানবে তাদের ইলম হবে আল্লাহর ইলমের মোতাবেক ইলম। আল্লাহ প্রদত্ত ইলম এবং সত্যিকারের ইলম। আর যারা কিতালকে অকল্যাণকর বলে জানবে তাদের কাছে জাহিরি ভাবে যা আছে তা প্রকৃত অর্থে ইলম না, বরং তা হচ্ছে জাহালাত।

আল্লাহ প্রদত্ত ইলম যার কাছে যত বেশি পরিমাণে থাকবে কিতালের কল্যাণের দিকগুলো তার কাছে তত বেশি স্পষ্ট ও পরিষ্কার হবে। এর বিপরীত প্রকৃত ইলম যার কাছে একদম থাকবেই না বা কম থাকবে তার কাছে কিতালের কল্যাণের দিকগুলো তত অস্পষ্ট মনে হবে।

প্রকৃত ইলমের পরিচয়

সাহাবায়ে কেরাম (রাযি)-এর মধ্যে সবার কাছে কিতালের কল্যাণকর দিকগুলো স্পষ্ট ছিলো। তাঁদের মধ্যে একজনও এমন ছিলেন না যার কাছে কিতালের বিষয়টি অস্পষ্ট ছিলো। তাঁরা সবাই কিতালে অংশগ্রহণ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি) সাহাবায়ে কেরামের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, أعمقها علما তাঁরা ছিলেন গোটা উম্মাহর মধ্যে সুগভীর ইলমের অধিকারী। অথচ তাঁরা আমাদের মতো এত পণ্ডিতি জানতেন না। কিন্তু তারপরও তাঁরাই হলেন প্রকৃত ইলমের অধিকারী।

প্রকৃত ইলম আসলে কিসের নাম? কী তার পরিচয়? প্রকৃত ইলম হলো, আল্লাহ তাআলার ‘তাকাযা’টা জানা ও বুঝা। এ মুহূর্তে আল্লাহ আমার কাছ থেকে কী চান, তা জানা ও বুঝার নামই হলো ইলম। এটি যে পেল সেই প্রকৃত ইলম পেল। সে-ই সহীহ ইলম লাভ করলো। আর এটি যে পেল না সে প্রকৃত ইলমও পেল না। এ মুহূর্তে আল্লাহ তার কাছে কী চান, তা সে জানে না, তা সে বুঝতে পারে না, এমন ব্যক্তি হাজারও পণ্ডিতি জানতে পারে, অজানা অনেক কিছু তার জানা থাকতে পারে কিন্তু ইলম যাকে বলে তা

তার কাছে নেই, তা সে পায়নি। এমন ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলা যেতে পারে, আহবার বলা যেতে পারে কিন্তু প্রকৃত অর্থে আলেম কোনো ক্রমেই বলা যায় না।

কুরআনী ইলম চর্চার উপযুক্ত পরিবেশ

সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ (রহ) তাঁর এক কিতাবে বলেছেন, ইলমের জন্য উপযোগী পরিবেশ জরুরি। প্রত্যেকটি জিনিস তার উপযুক্ত পরিবেশে যেভাবে পরিচর্যা হয়, উন্নতি হয়, অন্য কোথাও সেভাবে পরিচর্যা হয় না, উন্নতি হয় না। কোনো ফলের মৌসুমে সেই ফলের ফলন যেমন হয়, অন্য সময় তা হয় না। ঠিক তেমনিভাবে ইলমেরও কিছু পরিবেশ আছে, মৌসুম আছে। সেই পরিবেশে ইলম যেভাবে উন্নতি সাধন করে অন্য পরিবেশে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

ইলমের উৎস হলো কুরআনুল কারীম। আর কুরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা সাহাবায়ে কেরামের সামনে পড়ে শুনিয়েছেন। তাঁদেরকে কুরআনের ইলম শিখিয়েছেন। কুরআনে কারীমের বড়ো একটি অংশ বিশেষ করে বিধি-বিধান সংক্রান্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে মদিনায়।

সাইয়্যেদ কুতুব (রহ) বলেন, সাহাবায়ে কেরামকে কুরআন পাঠ করে শোনানো হচ্ছে যখন তাঁরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন কিংবা যুদ্ধে

গমন করছেন অথবা যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করছেন কিংবা যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছেন। এ অবস্থাগুলোর মধ্যে তাদের ওপর কুরআন নাযিল হচ্ছিলো আর তাঁদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনানো হচ্ছিলো। এ অবস্থায় তাঁরা কুরআন বুঝছিলেন এবং তার ওপর আমল করছিলেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে এ অবস্থাগুলোর মধ্যেই কুরআনের ইলম দিয়েছেন। তাঁদের এ অবস্থাগুলোকেই তিনি কুরআনী ইলম চর্চার ক্ষেত্র বানিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, এগুলোই হলো কুরআনী ইলম চর্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র। অতএব যারা বলেন, যুদ্ধ-জিহাদ কুরআনী ইলম চর্চার পরিপন্থী জিনিস, তাদের কথা যে ভুল তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

বলুন তো, মদিনার জীবনে এই চার অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো অবস্থা কি ছিলো? সাহাবীগণ হয় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, না হয় যুদ্ধে গমন করছেন, না হয় যুদ্ধের ময়দানে অবস্থান করছেন, না হয় যুদ্ধ থেকে ফিরে আসছেন। এই চার অবস্থার মধ্যেই তো সাহাবীগণ তাঁদের মদিনার জীবন কাটিয়েছেন আর এ অবস্থাগুলোর মধ্যেই তারা ইলম শিখেছেন।

অতএব আমরাও যদি তাঁদের মতো সহীহ ইলম লাভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকেও এই চার অবস্থার কোনো অবস্থা নিজের মধ্যে আনতে হবে। আমাদের মধ্যে যারা যত সুন্দর ভাবে এ অবস্থাগুলো নিজের মাঝে আনতে পারবে তারা সেই পরিমাণ সহীহ ইলম লাভ করতে পারবে। পক্ষান্তরে যারা এ অবস্থাগুলো থেকে যত দূরে

থাকবে তারা কুরআনী ইলম থেকে তত দূরে থাকবে। সহীহ ইলম কী, তা তারা বুঝবেই না।

দেখুন আল্লাহ তাআলা কী বলছেন?

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ

“তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত এবং তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে। তাই তারা বুঝে না।” (সূরা তাওবা ০৯:৯৩)

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ

“তারা পেছনে পড়ে থাকা লোকদের সঙ্গে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত। আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। তাই তারা বুঝে না।” (সূরা তাওবা ০৯:৮৭)

ইমাম রাযী (রহ) বলেন,

﴿وطَبَعَ اللّهُ على قُلُوبِهِمْ﴾ يَعْنِي أنَّ السَّبَبَ في نَفْرَتِهِمْ عَنِ الجِهادِ، هو أنَّ اللَّهَ طَبَعَ عَلى قُلُوبِهِمْ، فَلِأجْلِ ذَلِكَ الطَّبْعِ لا يَعْلَمُونَ ما في الجِهادِ مِن مَنافِعِ الدِّينِ والدُّنْيا.

জিহাদের প্রতি তাদের অনীহার কারণ হলো, আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন। এই মোহর এঁটে দেয়ার কারণেই জিহাদে দীন-দুনিয়ার কতো যে উপকারিতা রয়েছে, তা তাদের বুঝে আসে না। (তাফসীরে রাযী)

কতো স্পষ্ট করে তিনি বলছেন, তাদের অন্তরে মোহর এঁটে দেয়ার কারণেই তারা জিহাদের উপকারিতা বুঝতে পারে না।

বর্তমানেও আমরা এমন কতজনকে দেখতে পাই, যাদেরকে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম-উলামা বলে মনে করা হয়, কিন্তু জিহাদ ও কিতালের বিষয়টি তাঁদের কাছে স্পষ্ট না। তাঁদের দৃষ্টিতে বর্তমানে জিহাদের উপকারিতার চেয়ে ক্ষতিই নাকি বেশি। তাঁদেরকে দেখা যায়, ছোটো ছোটো অনেক মাসআলা নিয়ে মাসের পর মাস ব্যাপী গবেষণা করেন, কিন্তু জিহাদ ও কিতাল নিয়ে তাঁদের তেমন কোনো পড়াশোনা নেই। ফলে দেখা যায়, জিহাদের ব্যাপারে এমন সব কথা বার্তা বলেন, এমন আজগুবি সব শর্তের কথা বলেন যা ফিকহের কোনো কিতাবে নেই। অথচ ওই আজগুবি শর্তগুলোর ওপর ভরসা করেই তাঁরা নিজেদের জিহাদ বিমুখতাকে বৈধতা দেন।

দীনের সঠিক বুঝধারী দল কোনটি?

মুআবিয়া (রাযি) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَلَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: لَا تَزَالُ طائفة من أمتي ظَاهِرِينَ عَلَى الحق)

“আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন এবং সর্বদা মুসলমানদের একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিতাল করতে থাকবে। তাঁরা ওই সব লোকের ওপর বিজয়ী থাকবে যারা তাদের বিরোধিতা করবে। কিয়ামত অবধি এভাবে চলতে থাকবে।” (সহীহ মুসলিম : ৪৮৫০)

হাদীসে দুটি অংশ। প্রথমটি হলো, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। আর দ্বিতীয়টি হলো, সর্বদা মুসলমানদের একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে কিতাল করতে থাকবে।...

হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, মুসলমানদের মধ্যে কিতালরত দলটিই হলো এমন দল যাদেরকে আল্লাহ দীনের ঠিক বুঝ দান করেছেন।

এর বিপরীতে যারা কিতালরত না এবং অন্তরে কিতালে অংশগ্রহণের দৃঢ় সংকল্প ও প্রেরণাও রাখে না তাদের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ. (صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب ذم من مات ولم يغز)

"যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো যে, কিতাল করেনি এবং অন্তরে কিতালে অংশগ্রহণের প্রেরণাও রাখেনি সে নিফাকের একটি শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করল।" (সহীহ মুসলিম: ১৯১০)

দেখুন হাদীসে স্পষ্ট বলা হচ্ছে, যারা যুদ্ধরত না, যুদ্ধের প্রেরণাও পোষণ করে না, তারা নিফাকের শাখার ওপর মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যু যদি হয় নিফাকের ওপর, তাহলে জীবনটা কাটিয়েছে কীসের ওপর? নিফাকের ওপরই তো, তাই না?

হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে, যার অন্তরে জিহাদে প্রেরণা নেই সে নিফাকের ওপর আছে, তাদের অন্তরে নিফাক আছে। আর একথা তো স্পষ্ট, কারও অন্তরে নিফাক থাকলে সে দীনের ঠিক বুঝ থেকে বঞ্চিত হবে।

পুরো আলোচনার সারাংশ হলো, সূরা তাওবার এ আয়াতে (০৯ : ১৪-১৫) আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিতালের নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি কিতালের ছয়টি উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। আয়াতের শেষে তাঁর গুণবাচক দুটি নাম এনেছেন। ‘আলীম ও হাকীম’- সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, কিতালের এ নির্দেশ তিনি তাঁর অসীম ইলম ও হিকমতের আলোকেই দিয়েছেন। এ নির্দেশ তাঁর ইলম ও হিকমতেরই বহিঃপ্রকাশ। আমাদের কর্তব্য হলো, আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথানত করে দেওয়া। তাঁর হুকুমের রহস্য আমাদের বুঝে আসুক বা না আসুক। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাঁর একান্ত বাধ্য বান্দা হিসেবে কবুল করেন এবং তাঁর ছোটো-বড়ো প্রতিটি হুকুম যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করেন আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين

وآخردعوانا أن الحمد لله رب العالمين

****